সুন্দর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুমিতা চক্রবর্তী

শিল্পের সৃষ্টি আর সুন্দরের ধারণা উৎসকাল থেকেই পরস্পর অন্বিত। শিল্প -সংক্রান্ত যে প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে সেটি হল অ্যারিস্টট্‌ল-এর রচিত কাব্যতত্ত্ব (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৫ অব্দ থেকে ৩৩২ অব্দের মধ্যে লেখা)। সেই লেখাতেই আরিস্টট্‌ল যখন শিল্পকে মানুষের পার্থিব অভিজ্ঞতার অনুকরণ বলে অভিহিত করেছেন সেখানেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই অনুকরণ যান্ত্রিক নকল নয়, শৈল্পিক পুনর্নির্মাণ। কারণ শিল্পী সেই স্ব-সৃষ্টি রূপাবয়বটিতে নিজের কল্পনা ও ঔচিত্যবোধ অনুসারে সম্ভাব্য ঘটনাবলি যোজনা করতে পারেন, বর্ণনীয় বিষয় নির্বাচন করে নিতে পারেন এবং সেই নির্বাচিত উপাদান শৈল্পিক অভিপ্রায় অনুসারে পুনর্বিন্যস্ত করতে পারেন। এবং এসবই তিনি করতে পারেন কারণ তাঁর আছে জন্মগত সৌষম্যবোধ। আরিস্টটল-এর ভাষায়—'কাজেই অনুকরণ মানুষের স্বভাবগত; ঠিক সেইরকম স্বভাবগত হল সুষমা ও ছন্দের বোধ। এইসব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ক্রমশই পরিণত হয়েছে এবং নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে কাব্য।' (কাব্যতত্ত্ব, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ, প্যাপিরাস, কলকাতা, সংস্করণ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা : ৫৩)। 'সুষমা ও ছন্দের বোধ' বলতে যা বুঝিয়েছেন আরিস্টট্‌ল, তাকেই আমরা মানুষের স্বভাবগত সৌন্দর্যবোধ বলতে পারি।

কিন্তু মানুষের স্বভাব কোনো অর্থেই সরল নয়, মানব - মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াই হল জটিলতার গ্রন্থি নির্মাণ। পাশব সারল্য মানুষের অধিগত নয় বলেই সে মানুষ হয়ে উঠেছে। কাজেই মানুষের স্বভাবগত সৌন্দর্যবোধও বিভিন্ন কারণে বহুবিধ প্রশ্নের জন্ম দেয় ও তার উত্তর সন্ধানে তাকে প্রবৃত্ত করে।

প্রথম প্রশ্ন, কোন্ মানদণ্ডে মানুষ নির্বাচন করে সুন্দর এবং অসুন্দর বস্তু? প্রজাপতি সুন্দর এবং মাকড়সা অসুন্দর —এই সিদ্ধান্ত কার? ময়ূর সুন্দর, কিন্তু শকুনি সুন্দর নয়— এভাবেই দীর্ঘকাল শিল্পে, বিশেষত সাহিত্যে বিভিন্ন প্রাণীকে সুন্দর এবং অসুন্দরের পর্যায়ভুক্ত করে রাখা হয়েছে। এর মূলে আছে মানুষের সুখ-সুবিধাজনিত অভ্যাস এবং সামাজিক সংস্কার। প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে বেড়ায়, পুষ্পে পরাগ নিষেকে সাহায্য করে, ফলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়—এই বোধ এবং জ্ঞান প্রজাপতিকে মানুষের কাছে সুন্দরতর করেছে। কিন্তু মাকড়সা মানুষের ঘর - গৃহস্থালিতে অসুবিধা ঘটায়, চামড়ায় মাকড়সার স্পর্শ ক্ষতিকারক— তাই মাকড়সা অবশ্যই অসুন্দর। এ জন্যই মশা, মাছি ব্যাং, আরশোলা, ইঁদুর, পিঁপড়ে ইত্যাদিকে উনিশ শতক পর্যন্ত শিল্প-সাহিত্যের রূপায়ণে কোনো সৌন্দর্য -চেতনার আধার হয়ে উঠতে দেখা যায় না। শকুনির বিচরণ শ্মশানে। মানুষের মৃত্যুশোকের সঙ্গে শকুনির অস্তিত্ব লগ্ন বলেই শকুনিকে অশুভ ও কুৎসিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাঘ-সিংহকে মানুষ কুৎসিত বলে তুচ্ছ করতে পারেনি তাদের শারীরিক শক্তি এবং অরণ্যের অধিকারের প্রতি সম্ভ্রমে। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিজ পশু-পাখি-পতঙ্গ-সরীসৃপের মধ্যে সুন্দর-অসুন্দরের এই ভেদ ভাবনা স্বীকৃত ছিল রবীন্দ্রনাথেরও লেখায়। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীতে। বিজ্ঞানবোধ আর পরিবেশ-ভাবনার মিশ্রণে মানুষের প্রকৃতি পাঠের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত হল। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও রোমান্টিক যুগের পরিণতি-পর্ব পর্যন্ত সুন্দর-অসুন্দরের এই পার্থক্যই বলবৎ ছিল; কিন্তু ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সাহিত্যে বোদল্যের বিপুলভাবে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলেন যখন তিনি ঘোষণা করলেন যে বিকলাঙ্গতারও আছে এক সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যেরও সন্ধান রাখতে হবে শিল্পীকে। ফরাসি সাহিত্যে বোদল্যের ও র‍্যাঁবো-র কলমে এই যে পরিবর্তন সূচিত হল— তা সার্বিক স্বীকৃতি পেল প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তরকালে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সর্বত্র। বোদল্যের লিখেছিলেন—

> An artist is an artist only by dint of his exquisite sense of beauty-a sense affording him rapturous enjoyment but at the same time implying or involving, an equally exquisite sense of deformity or disproportionate. (baudelaire as a literary Critic, selected Essays, Introduction & Tr. Lois Boe Hyslop & E. Hyslop Jr., Pennsylvania State University Press, 1964, P 129).

সৌন্দর্যের আর এক মান-নির্ণায়ক হল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি। নারীরা বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কারণে পুরুষের থেকে কিছু অতিরিক্ত সাজসজ্জা ও ভূষণ-বিলাস অভ্যাস করেছিল। পুরুষও নারীকে করায়ও রাখার কৌশল হিসেবে তার রূপচর্চা ও অলঙ্কারপ্রিয়তাকে অমিত প্রশ্রয় দিয়েছে দীর্ঘকাল। ফলে এই অতিরিক্ত রূপচর্চা ও অলংকার ধারণ যে 'সুন্দর'— এই দৃষ্টিকোণ অভ্যাস হয়ে গেছে মানুষের। এই অভ্যাসেরই ক্ষতিকারক বিস্তার ঘটেছিল চীন দেশের মেয়েদের পায়ের পাতা ছোটো রাখার জন্য কাঠের জুতো পরিয়ে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ করে দেবার চেষ্টায়। পা যদি দুর্বল থাকে তাহলে বাড়ির বাইরে মেয়েরা যেতে পারবে না। গৌরবর্ণ যে কৃষ্ণবর্ণের চেয়ে সুন্দর এই ধারণার বিকাশ অনেকটাই রাজনৈতিক পরিস্থিতি জাত। শ্বেতাঙ্গ আর্যরা ভারতের কৃষ্ণাঙ্গ আদিবাসীদের পরাজিত করেছিল। সাদা চামড়ার সঙ্গে সৌন্দর্যের এবং সম্ভ্রমের অনুভূতি গেছে জড়িয়ে। বিস্তৃত দেশ ভারতবর্ষে অবশ্য সৌন্দর্যবোধের পৃথিবীতে এই শ্বেতবর্ণ - প্রীতির এক শৈল্পিক প্রতিবাদও লক্ষণীয়— দূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র, নীলকান্তমণি সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রবল আকর্ষক শ্যামাঙ্গী রূপবতী দ্রৌপদীর বর্ণনায়।

ভেবে দেখতে গেলে এই শুভ্রতা-প্রীতিরও মূলে মানুষের ব্যবহারিক সুবিদা-অসুবিধার প্রশ্নটি অনুপস্থিত নয়। যে কালে বিদ্যুৎ এবং খনিজ তেল আবিষ্কৃত হয়নি; তারও অনেক অনেক শতাব্দী আগে যখন আগুন জ্বালাতেও শেখেনি মানুষ তখন অন্ধকার ছিল মানুষের কাছে বিপজ্জনক। বন্য পশুর দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় অনেক গুণ বেড়ে যেতে অন্ধকার রাত্রিতে। শ্বেতবর্ণ সুন্দর আর কৃষ্ণবর্ণ অসুন্দর— এই সংস্কারের জন্ম তখন থেকেই। না হলে স্বল্প সংখ্যক শ্বেতাঙ্গকে সহজেই মেরে ফেলতে পারত বিপুল সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ আদিবাসীরা। পারেনি, তার কারণ সাদা তাদের কাছে সূর্যের রং; ঈশ্বরের রং। সাদা মানুষেরা হয়তো বা ঈশ্বর-প্রেরিত।

'সুন্দর' বলতে ঠিক কী বোঝায়, ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু 'সুন্দর' ও 'সৌন্দর্য' -এর উল্লেখ ও প্রসঙ্গ আছে বেশ স্পষ্টভাবেই। বিনা অলংকারে কাব্য সুন্দর হয় না—একথা বলেছেন ভামহ তাঁর কাব্যালংকার গ্রন্থে। 'কাব্যালংকারসূত্র' প্রণেতা বামন বলেছেন 'সৌন্দর্যমলংকারম্'। কিন্তু তাঁর মতে কাব্যসৌন্দর্যের নিত্য ধর্ম হচ্ছে 'গুণ' এবং অনিত্য

উপাদান হল 'অলংকার'। এখানে 'গুণ' শব্দে তিনি নির্দেশ করেছেন 'কর্তারোধর্মাগুণাঃ' অর্থাৎ কাব্যের যে যা যারা কর্তা, তাদের ধর্ম হল গুণ। বীররসের কাব্য হলে 'বীরত্ব', মধুর রসে কাব্য হলে 'মধুরতা'-ই হবে তার গুণ। মনে রাখতে হবে প্রাচ্য কাব্যতত্ত্বে রসাত্মক বাক্যকেই বলা হয়েছে কাব্য এবং সেই রস হৃদয়ভাব থেকেই জাগ্রত হয়— একথাও বলা হয়েছে। প্রাচ্য কাব্যতত্ত্বে আটটি স্থায়ী হৃদয়ভাবের মধ্যে স্বীকার করা হয়েছে ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সাকেও। সেই সঙ্গে রসশাস্ত্রীরা স্বীকার করেছেন রৌদ্র, ভয়ানক এবং বীভৎস রসের অস্তিত্বও। অতএব সমীকরণটি থেকে যে সিদ্ধান্তে আমার পৌঁছোই তা এই— কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ভাববস্তুর ধর্ম যদি 'জুগুপ্সা' হয় তাহলে এই জুগুপ্সা-ই সেই কাব্যের 'গুণ'। এই 'গুণ' -ই হল কাব্যসৌন্দর্যের নিত্য ধর্ম। এই ধর্মকে ঠিকমতো ব্যঞ্জিত বা আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক গ্রন্থের সূত্র অনুসারে যথোচিতভাবে 'ধ্বনিত' করতে পারলেই কাব্য হবে সুন্দর। খুব মোটা দাগের তুলনা দিয়ে বলা চলে ফুলের উপর প্রজাপতির বর্ণনাও যেমন সুন্দর হতে পারে, তেমনই হতে পারে ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপানের দৃশ্য। এই সিদ্ধান্তে বিসময়ের কিছুই নেই। সর্বত্রই ধ্রুপদি শিল্পতত্ত্বে, ধ্রুপদি সাহিত্যে দেখতে পাই এই নিদর্শন। যা বাস্তবসম্মত এবং নিবিড় হৃদয়ভাবস্পন্দিত তার ব্যঞ্জনাই কাব্যরস তা কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করবে। শিল্প-রচনারীতির ঔচিত্যে ও সামঞ্জস্যেই শিল্পের সুন্দর ওঠে জেগে। অনৌচিত্যই অসুন্দর—আর কিছুই অসুন্দর নয় শিল্পের ভুবনে।

প্রতিটি স্থায়ী ভাব সঞ্জাত যে কোনো ভাষা-অবয়ব ঔচিত্যগুণ সম্পন্ন হলেই সুন্দর হবে— ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে তত্ত্বগতভাবে এই অভিমত স্বীকৃত হলেও বাস্তব সাহিত্যিক দৃষ্টান্তে কিন্তু দেখা যায় প্রথাসিদ্ধ অর্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গ-সংস্থানকেই 'সুন্দর' বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মানব-শরীরের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনার বিশেষ ধরনের কয়েকটি 'টাইপ' রীতিমতো নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল সংস্কৃত সাহিত্যে। পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সাহিত্যে সৌন্দর্যের মানদণ্ড হত 'প্রোপোর্শন' -এর নিরিখে। সেখানেও আমরা কিছু কিছু 'টাইপ'- এর সন্ধান পাই। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ধ্রুপদি রূপ - কল্পনা অমিত প্রাণাবেগে সেই 'টাইপ' লক্ষণগুলি অতিক্রম করে গিয়েছিল—তা হল হেলেন -এর ক্ষেত্রে। হেলেন-এর রূপকে অনুপুঙ্খ প্রত্যঙ্গ বর্ণনায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হয়নি। হেলেন -এর অপার্থিব সৌন্দর্য তার পারিপার্শ্বিককে কীভাবে সম্মোহিত করে দেয়— কেবল সেই বর্ণনাটুকুই দিয়েছিলেন ধ্রুপদি মহাকাব্যের কবি। পাশ্চাত্য সৌন্দর্য-ধারণায় রোমান্টিকতার বীজ নিঃসন্দেহে লোকোত্তর রূপসি হেলেন-এর করতলে বহুপল হিরের মতোই মুগ্ধ রহস্য জড়ানো।

ইয়োরোপ-এর শিল্পতত্ত্বে ধ্রুপদি সৌন্দর্য-ধারণায় পরিবর্তন ঘটালেন রোমান্টিক যুগের কবিরা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যেই যে রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে গেল জার্মানিতে এবং ইংল্যান্ড-এ— সেই মনোভঙ্গিতে সৌন্দর্য-ধারণার স্থান ছিল সুবিস্তৃত। রোমান্টিক চিন্তাবিদদের সৌন্দর্য - ধারণা বিস্তৃত আলোচনায় বিষয়। কোলরিজ ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া গ্রন্থে 'বিউটি' অর্থাৎ সৌন্দর্য-ধারণা নিয়ে অনেক কথা লিখলেন। রোমান্টিক কবিদের ভাবনার, কল্পনায় ও রচনায় জড়িয়ে গেল সৌন্দর্য - ধারণার ঐশ্বর্যময় বৈচিত্র্য। তাঁরা বললেন সুন্দর হবে আনন্দদায়ক; সুন্দর হবে অস্তিত্বের চরমোৎকর্ষের ('পারফেকশন') ভাবাদর্শ। সেই সঙ্গে সৌন্দর্যের সঙ্গে 'ট্রুথ' অর্থাৎ সত্যের ধারণাকে তাঁরা একীভূত করে নিলেন। কবি কিটস-এর বিখ্যাত অভিব্যক্তি— 'Beauty is truth, Truth beauty'—এই ধারণারই প্রতিভাস। সেই সঙ্গেই রোমান্টিকতার সৌন্দর্যতত্ত্বে এ-ও প্রতিষ্ঠিত হল যে সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে মিশে থাকবে প্রগাঢ় বিস্ময়বোধ এবং সৌন্দর্যদৃষ্টি অনেকটাই মন্ময় উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল।

উনিশ শতকে প্রধান পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল রোমান্টিকতাবাদ। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র অ্যারিস্টটল -এর অনুকরণবাদী কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; যদিও ইয়োরোপীয় প্রত্যক্ষতাবাদ অর্থাৎ পজিটিভজম্-এর প্রভাব ছিল তাঁর চিন্তাধারায়; যদিও সমাজের হিতসাধন বিষয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত—তবু রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের সৌন্দর্য-ধারণার প্রাবল্যকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

> মনুষ্যের কার্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচ্চিত বর্ণনা দ্বারা সৌন্দর্যের সৃজন, কাব্যের উদ্দেশ্য। ...ইংরাজি আলঙ্কারিকেরা তাহাকে Passions বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এই বিষয়ে তাঁর দ্বিধা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। একটা দোলাচলতা থেকেই গিয়েছিল। সাহিত্য বিষয়ে প্রত্যক্ষতাবাদী মননচর্যা-জাত সামাজিক উপযোগিতাবাদের তত্ত্ব আর রোমান্টিক নন্দনতাত্ত্বিকদের উপলব্ধি-প্রধান, কল্পনা-গৌরবী, সৌন্দর্য-আনন্দ-সত্যবোধ (ট্রুথ) সম্পন্ন দার্শনিকতা ঘেঁষা সাহিত্যতত্ত্বকে এক আধারে মিলিয়ে দেওয়া খুব সুসাধ্য কোনো ক্রিয়া নয়। কালক্রমে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে বঙ্কিম-মানসের এই বহুধা গতি আরও বেড়ে যায়। যদিও সাহিত্যের রূপলক্ষণ সৌন্দর্য; এবং সাহিত্যের অবলম্বন মানবজীবন, মানবীয় উপলব্ধি, বাস্তব জগৎ—আরিস্টটাল-এর মতোই স্পষ্টভাবে তিনিও স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যটা ঠিক কী হওয়া উচিত— সে বিষয়ে তিনি মনস্থির করতে পারেননি। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' (প্রচার মাঘ ১২৯১ বঙ্গাব্দ, ১৮৫৫) লেখাটিতে যখন সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে সাহিত্য -সম্পর্কিত নিজস্ব নীতিগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন তখনই অসংগতিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আরও বেশি।

'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন।' (সূত্র ৩)

উদ্ধৃতিটির 'অথবা' অব্যয়টি লক্ষণীয়। সাহিত্য সৃষ্টির দুটি উদ্দেশ্যকে পাশাপাশি রেখেছেন বঙ্কিম। কিন্তু একটি অপরটির সঙ্গে নাও মিলতে পারে— এ সত্যটিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। 'মনুষ্যজাতির' মঙ্গলসাধন' ঘটে এমন লেখা লিখতে পারেন সাহিত্যিক কিন্তু তা সৌন্দর্য সৃষ্টি-ক্ষমতার উদ্ভাসন না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে তিনি কি লিখবেন, অথবা লিখবেন না? আবার সৌন্দর্য সৃষ্টি হল কিনতু 'মনুষ্যজাতির কোনো উপকার' সাধিত হল না— সে ক্ষেত্রেই বা লেখকের করণীয় কী? এবংবিধ প্রশ্নের উত্তর মেলে না।

বাংলা সাহিত্যে আমরা বঙ্গিমচন্দ্রের পরে পেয়েছি রবীন্দ্রনাথকে যিনি সৌন্দর্য সম্পর্কে অনেকটাই ভেবেছিলেন এবং

শিল্পসৃষ্টিতে সুন্দর কীভাবে প্রতিভাত হয় সে সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে গেছেন নিজের ভাবনা। তাঁর ভাবনা স্পর্শ করেছে সৌন্দর্যচেতনার উৎসক্রিয়াকে। সামান্য স্ববিরোধও যে দেখা যায় না তা নয়। প্রবন্ধগুলি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে পঞ্চভূত গ্রন্থটি সেখানেই আছে সৌন্দর্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা। সৌন্দর্যকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এক মন্ময় (সাবজেকটিভ) হৃদয়াব রূপে। আকৃতির সামঞ্জস্য (অ্যারিস্টটল-এর মতানুযায়ী) নয়; তিনি সত্য, মঙ্গল ও পূর্ণের বোধ যা জাগাতে পারে তাকেই বলেছেন 'সুন্দর'। এই মঙ্গলও আবার সামাজিক কর্তব্যকর্মের মঙ্গল নয়। ক্ষুধার্তের জন্য লঙ্গরখানা খুললে সেই লঙ্গরখানার বিবরণ দেওয়া হবে যে-সাহিত্যে তা রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগত না বলেই মনে হয়। 'মঙ্গল' শব্দটিও এখানে এক পূর্ণতাবোধেই দ্যোতক। —'সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ' ('সৌন্দর্যবোধ', সাহিত্য)। পঞ্চভূত গ্রন্থের 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' প্রবন্ধে ব্যোমের উক্তি—

'ঐ যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য বলি, সেটা তাহার নিজের সৃষ্টি। সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ো মাঝখানকার সেতু।' এইভাবে ভাবলে বস্তুর সুন্দর, মঙ্গাল, পূর্ণ, সত্য, আনন্দ— সবকটি ধারণাই হয়ে দাঁড়ায় প্রায় একই মন্ময় উপলব্ধি এবং সেই মন্ময়তার দিক থেকে দেখা দার্শনিক প্রতীতি। রোমান্টিক সৌন্দর্য-ধারণার কেন্দ্র-কথাটি কিন্তু ওই মন্ময়তাই। 'সুন্দরের অবস্থান দ্রষ্টার দুইচোখে' —এই বাণীই রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধের নির্যাস।

রবীন্দ্রনাথ এই উপলব্ধিকে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মাবাদের দিকে নিয়ে গেলেন—যতদূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব। অ-কৈশোর ঔপনিষদিক শিক্ষায় শ্বাস গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাই সুন্দর-ধারণার সঙ্গে প্রাচ্য দর্শনের আনন্দ, সত্য, সচ্চিদানন্দ, শান্তি ও পরম পূর্ণতাবোধের সংশ্লেষ তাঁর অন্তরে সৌন্দর্য-চেতনার যে নিজস্ব রূপ নির্মাণ করল তা রোমান্টিক সৌন্দর্য-ধারণা থেকে কিছুটা পৃথকও।

রবীন্দ্র-উত্তরকালের সাহিত্যিকেরা সুন্দরের চেতনাকে অনেকটাই পাশ্চাত্য রোমান্টিকতার অনুক্রমেই গ্রহণ করলেন। তাঁদের সৌন্দর্য-দৃষ্টি প্রধানত মন্ময়। ধ্রুপদি যুগের প্রত্যক্ষ প্রাঞ্জলতা এবং প্রথাসিদ্ধ বস্তু - সৌন্দর্য - রূপময়তাকে তাঁরা অনেক সময়েই গ্রহণ করলেন না। যে-কোনো রূপাবয়বে নিজেদের মনের ও দৃষ্টির অভিক্ষেপণ মিশিয়ে তাঁরা কখনো অনুভব করলেন প্রগাঢ় মুগ্ধতা, কখনো অতিপ্রাকৃতের শিহরণ, কখনো নিয়তির সংকেত, কখনো দূরাভিসারী মানস-যাত্রা, কখনো প্রশান্ত আশ্রয়, কখনো সপ্রেম সম্মোহন। এমনকী কখনো কখনো বোদল্যের কথিত সেই কুৎসিতের আকর্ষণও তাঁদের সৌন্দর্য-ভাবনায় মিশে গেল।

রবীন্দ্র-উত্তরকালের কবিতায় সুন্দরের বিচিত্র রূপের সন্ধান আমরা পাই; তেমনই পাই কথা-সাহিত্যেও। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর কবিতার চেয়ে কোনো অংশে কম হয় না তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে সুন্দরের অভিজ্ঞান সন্ধানের আকর্ষণ ও আনন্দ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায়, দৃষ্টিতে ও মনোভূমিতে এই সুন্দরের মূর্তি কীভাবে গড়ে উঠেছিল সেদিকে দৃষ্টিপাত করি একটু।

প্রথমেই বলে নেওয়া যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুন্দর' অনুভবের দৃষ্টি-সরণিতে কোনো জটিলতা নেই। রোমান্টিক শিল্পতত্ত্বে সুন্দরের ধারণার প্রধান অবলম্বন দুটি— এক। প্রাকৃত ভুবন—তার মধ্যে আছে বৃক্ষলতা, প্রাণী-জগৎ ও সৌরমণ্ডল। দুই. মানব-শরীর। রোমান্টিক সৌন্দর্য-চেতনার একটি তৃতীয় ভুবন আছে— তা হল মানুষের কারুশিল্পে প্রতিফলিত রূপের প্রতিভাস—যা স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, গৃহসজ্জার বর্ণনায়, বেশভূষা-আভরণের নক্‌শায় প্রতিবিম্বিত হয়ে আমাদের মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে, জীবনানন্দের 'নগ্ননির্জন হাত' কবিতায়, অমিয়ভূষণের অনেক উপন্যাসে এই সুন্দরের রূপচিত্রণ আছে। কিন্তু এই পর্বের কথাসাহিত্যে প্রধানত প্রকৃতি আর মানুষের বর্ণনাতেই সৌন্দর্য-সত্তার প্রকাশ ঘটেছে লেখকের অভিপ্রায় অনুসারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও ব্যতিক্রম নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের ভাষাতেই আমরা শুনেছি দিবারাত্রি কাব্য উপন্যাসটিকে 'রোমান্টিক কাহিনি' বলে অভিহিত করেছেন তিনি (লেখকের কথা)। উপন্যাসটি প্রথম থেকেই রোমান্টিকতার তলে প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবের বর্ণনাও নেই, আখ্যানও নয়। চরিত্রগুলি অতিমাত্রায় 'প্যাশনেট'। প্রধান চরিত্র হেরম্ব আর আনন্দ—দুজনেরই মন দূরাভিসারী; কল্প-অস্তিত্বেই তাদের আশ্রয়। হেরম্বের চোখে তার ভালো লাগার নারী আনন্দ এবং ঘিরে থাকা প্রকৃতি কোন্ সৌন্দর্যের আধার রূপে উপস্থিত হয় তার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি—

১। আনন্দকে চোখে দেখে হেরম্বের মনে যে আবেগ ও মোহ প্রথমেই সঞ্চারিত হয়েছিল এতক্ষণে তার মনের সর্বত্র তা সঞ্চারিত হয়ে তার সমস্ত মনোধর্মকে আশ্রয় করেছিল। নিজেকে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত ও মুগ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করার বিস্ময় অপনোদিত হয়ে গিয়েছিল তার মনে, সেই স্তরে উঠে এসেছিল যেখানে আনন্দের অনির্বচনীয় আকর্ষণ চিরন্তন সত্য।

২। পৃথিবী জুড়ে নয়, এইখানে সন্ধ্যা নামছে। পৃথিবীর আর এক পিঠে এখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমগ্রভাবে বিস্তৃত চলমান অবিচ্ছিন্ন দিন। এখানে যে রাত্রি আসছে তাকে নিজের দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছে মাটির পৃথিবী। পৃথিবী থেকে সূর্য যতদূর, মহাশূন্যে রাত্রি বিস্তার তার চেয়েও অনন্তগুণ বেশি। রাত্রির অন্ত নেই। মধ্যরাত্রিকে অবলম্বন করে কল্পনায় যতদূরই খুশি চলে যাওয়া যাক, রাত্রির শেষ মিলবে না। পৃথিবীর এক পিঠে যে আলো ধরা পড়ে দিন হয়েছে, অসীম শূন্যের শেষ পর্যন্ত তার অভাব কোথাও মেটেনি।

প্রথম উদ্ধৃতিতে আনন্দের রূপ আনন্দের শরীরে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি হেরম্বের চোখে ও মনে গড়ে উঠেছে। আনন্দের চেহারার কোনো বর্ণনাই নেই।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে প্রকৃতির বর্ণনা আছে। কিন্তু ভাব-সৌন্দর্য সঞ্চারিত হয়েছে হেরম্বের অনুভবের রঙে। এই নিসর্গ-রূপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত দার্শনিকতার বোধ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ভাবেই প্রকৃতি বর্ণনা করতেন।

পরবর্তী তৃতীয় উদ্ধৃতিটি আনন্দের নাচের দৃশ্য বর্ণনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতি যত্নে এই নৃত্যরূপ নির্মাণ করেছেন। তাঁর

ভাবনায় এই নাচ সেই সৌন্দর্য আদর্শের চরমোৎকর্ষের প্রতীক— যার পরে আর কিছু থাকে না। তাই এই নাচ আনন্দের আত্মহননে গিয়ে শেষ হয়। আদ্যন্ত রোমান্টিক সৌন্দর্যের পরিকল্পনা নৃত্যদৃশ্যে—

আনন্দ ধীরে ধীরে আগুনকে প্রদক্ষিন করতে আরম্ভ করল। অতি মৃদু তার গতি, কিন্তু চোখের পলকে ছন্দ চোখে পড়ে। এও সেই চন্দ্রকলা নাচেরই ছন্দ। সে নাচে তিল তিল করে আনন্দের দেহে জীবনের সঞ্চার হয়েছিল, আজ তেমনি ক্রমপদ্ধতিতে সে গতি সঞ্চয় করেছে। গতির সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লীলাচাঞ্চল্যের সমন্বয়, যার জন্ম চোখে পড়ে না, শুধু মনে হয় সমগ্র নৃত্যের রূপ ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হচ্ছে। প্রথমে আনন্দের দুটি হাত দেহের সঙ্গে মিশে ছিল, হাত দুটি যখন আগুনের কম্পিত আলোয় তরঙ্গ তুলে তুলে দুই দিগন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে গেল। তখন আনন্দের পরিক্রমা অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে। এমন যে তার নৃত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ, এই নৃত্যকে যে না চেনে তারও তা বোঝা কঠিন নয়।

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে প্রকৃতিকে জড়শক্তির প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই বর্ণনা সুন্দর কিন্তু তা মানুষের আশ্রয় নয়। মানব - সংসার সম্পর্কে উদাসীন সেই নিসর্গলোক। মানুষকে তা গ্রাস করে ফেলতে পারে নিমেষেই। অথচ তা কঠিন-সুন্দর। এমন দুটি অংশ দেখি উপন্যাসটি থেকে—

১। বটগাছের ঘন পাতাতেও বেশিক্ষণ আটকাইল না। হারু দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া উঠিল। স্থানটিতে ওজোনের ঝাঁঝালো সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিত। অদূরের ঝোপটির ভিতর হইতে কেয়ার সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সবুজ রঙের সরু লিকলিকে একটা সাপ একটি কেয়াকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। গায়ে বৃষ্টির জল লাগায় ধীরে ধীরে পাক খুলিয়া ঝোপের বাহিরে আসিল। ক্ষণকাল স্থিভাবে কুটিল অপলক চোখে হারুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার দুই পায়ের মধ্যে দিয়াই বটগাছের কোটরে অদৃস্য হইয়া গেল।

২। একদিন শশী হারু ঘোষের বাড়ির অদূরে তালবনের ধারে মাটির টিলাটিতে উঠিয়াছিল। বর্ষার পর টিলাটিতে উঠিয়াছিল। বর্ষার পর টিলাটি জঙ্গলে ঢাকিয়া যায়। জঙ্গল ভেদ করিয়া টিলাটির উপর উঠিবার কী দরকার ছিল শশীর? সূর্যাস্ত দেখিবে। দিগন্তের কোলে তরু শ্রেণি যে বাঁকা রেখাটি রচনা করিয়াছে তাহারই আড়াল হইতে দেখিবে সূর্যকে।

কী ছেলেমানুষি শখ! নিজের কাছে ছেলেমানুষ হইতে শশীর লজ্জা ছিল না। কেবল শখটি মিটাইতে গিয়া যে মূল্য তাহাকে দিতে হইল আগে জানিলে তাহাতে শশী রাজি হইত না। টিলার উপরে উঠিয়া পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়া সে যখন দাঁড়াইল তখন তাহার মন শান্তিতে ভরিয়া আছে। আগামী জীবনের যত ভালো মন্দ কাজ তাহাকে করিতে হইবে তাহা সম্পন্ন করিবার শক্তিতে সহজ বিশ্বাস আছে, সাহস আছে। কিন্তু সূর্য ডুবিবার আগে শশীর সহসা ভীত হইয়া পড়িল। ছেলেবেলায় মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়া এক একদিন তাহার যেমন ভয় করিত, তেমনি ভয়। শরীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কয়েক মিনিটের ভবিষ্যৎও তাহার আর অবশিষ্ট নাই, সে এমনি অসহায়, এমনি ভঙ্গুর। পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে, স্তরে স্তরে সাজানো ভয়ের তলে প্রোথিত পৃথিবীর বহু ঊধ্বে', একটা জঙ্গলাকীর্ণ মাটির টিলার শীর্ষে শশী হঠাৎ হারাইয়া গিয়াছে। সামনে রূপ-ধরা অনন্ত। সীমাহীন ধারণাতীত কী যে তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে শশী জানে না; কিন্তু আর কখনো নিশ্বাস সে লইতে পারিবে না।

ঠিক এইভাবে নির্সগ-রূপের সঙ্গে অস্তিত্বের নির্মম সত্যকে মিশিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত বাংলা উপন্যাসে বিশেষ পাওয়া যায় না। প্রকৃতিকে বাঙালি একটু বেশি কোমল করে দেখতে ভালোবাসে।

কুসুমকে যদিও শশী গ্রহণ করতে পারেনি—বাস্তব পরিস্থিতির বিবেচনা থেকে। তবু কুসুমকে সে ভালোবেসেছিল। কুসুমের চলে যাবার কালে যখন সে তার ভালোবাসার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য একটু অভিযোগের কথা তাকে শোনাতে এল তখন বিচিত্র অনুভূতির সমন্বয়ে কুসুমের আহত, অপমানিত, গর্বিত, প্রেমিকার রূপমূর্তিটি শশীর চোখে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছিল তার অনবদ্য কথাচিত্র আছে উপন্যাসটিতে—

একথায় ক্রোধের কী অপূর্ব ভঙ্গিই কুসুম কবিল! দুহাতে মুখের দুপাশের আলগা চুলগুলি পিছনে ঠেলিয়া দিয়া এমন তীব্রদৃষ্টিতে শশীর দিকে চাহিল যে মনে হইল শশী যে দুরন্ত অবাধ্য শিশু, এখুনি কুসুম তাকে একটা চড়চাপড় মারিয়া বসিবে। এমন তো ছিল না কুসুম। শশী কবে তাকে অপমান না করিয়াছে, কবে মান রাখিয়াছে তাহার অভিমানের, কবে এমন কথা বলিতে ছাড়িয়াছে যা শুনিলে গা জ্বলিয়া যায় না? কোনোদিন রাগ সে করে না, ভর্ৎসনার চোখে চাহে না ই আর এই সামান্য অপমানে সে একেবারে ফুঁসিয়া উঠিল বাঘিনির মতো!

কুসুমের এই অনমনীয় সৌন্দর্যই শেষ পর্যন্ত শশীর হৃদয়ে গাঁথা ছিল।

মানুষের রূপকে কীভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখতেন তার চমৎকার একটি উদাহরণ আছে অমৃতস্য পুত্রাঃ উপন্যাসে। এক মুগ্ধ পুরুষের চোখে নিতান্ত সাধারণ পরিবেশে এক নারী অভির্ভূত হয়েছিল— রানির মতো—

আয়নায় প্রতিফলিত রোদ আসিয়া পড়িবার কোনো দরকার ছিল না, মেয়েটির এঁটো বাসন মাজিতে বসিবার ভঙ্গিতেই যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল শঙ্করের। ...লম্বা-চওড়া অ-বাঙালি মেয়ের মতো শরীর, স্বাভাবিক রঙিন রং, পরণে অতিরিক্ত সাদা থান, এসবের জন্য নয়, এসব মিলিয়া জমকালো হইয়াছে শুধু মানুষটা, —নাটকীয় তার অকথ্য অবর্ণনীয় রাজরানির ভঙ্গিতে বাসন মাজিতে বসা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করিয়া আর যেন কাজ খুঁজিয়া পায় না, তাই রাগের মাথায় বাসন মাজিতে বসিয়াছে। রাগ কমিলেই সিংহাসনে গিয়া বসিবে।

এই 'রানিত্ব' সেই নারীর চোখ-মুখ-হাত-পা-এর গড়নে নয়; ছিল তার ব্যক্তিত্ব এবং দ্রষ্টার মুগ্ধ দুই চোখে। একেই বলা যেতে পারে সৌন্দর্যের 'হেলেন-এফেক্ট'। এই রূপের টানে মুগ্ধ হবার জন্য কোনো সাজসজ্জা, যৌবন, ভাবভঙ্গি—কিছুই লাগে না।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটিতে রোমান্টিক সৌন্দর্য-দৃষ্টির তুলনায় বাস্তবের কঠিন বর্ণনাই বেশি। অকূল-বিস্তার পদ্মার

উপস্থিতি সত্ত্বেও তাই সৌন্দর্য-মুগ্ধতার দৃষ্টিপাত তেমন অনুভূত হয় না। কিন্তু এই উপন্যাসের জটিলতম চরিত্র হোসেন মিয়ার চোখে ও মনে সেই উপলব্ধির উৎস-বীজ ছিল যেখান থেকে রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধের স্বতস্ফূর্ত উৎসারণ সম্ভব হতে পারে। হোসেন মিয়া এক প্রভুত্বকামী পুঁজিবাদী মানুষ। তোরা চালানের কারবার সে করে। কোন ক্যাপিটালিস্ট না করে — কোনো - না - কোনো ভাবে? সে কোনো ছোটোমাপের চোর নয়। সে বিত্ত সঞ্চয় করতে চায়, সে ঝুঁকি রনিতে পারে। সে নিজের উপনিবেশ গড়ে তুলে নিজে তার অবীশ্বর হতে চায়। এই চরিত্রের মানুষের মনে স্বপ্ন থাকবেই। সেই স্বপ্নই ভাবে হোসেন মিয়ার চোখে। সেখান থেকেই আসে তার সুন্দরের মূর্তি—

> হোসেন একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে তাকাইল। ইয়া আল্লা, নামানো আকাশের তলে কী দীনা এই পৃথিবী। ভিজিয়া চুপসিয়া চরিদিকে সকাতর হইয়া আছে। হোসেনের মনের কোণে একটু স্বাভাবিক কবিত্ব ছিল, জীবনে ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে হয়তো সে কয়েকটি গীতিকা রচনা করিত, তারমধ্যে দুটি একটি মুখে মুখে প্রচার হইয়া স্থান পাইত শতাব্দীর সঞ্চিত গ্রাম্যগীতিকার অমর অলিখিত কাব্যে— মাঠে ঘাটে, মশালের আলোয় আলোকিত উঠানে গীত হইয়া হইয়া ভনিতায় হোসেনর নাম দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িত, লোকে বলিত হোসেন ফকির, চল কেতুপুরে দেওয়ান ফকির হোসেন ছাহাবের দরগায় প্রদীপ জ্বালি।

এই হোসেন মিয়া যখন স্বপ্নদর্শী, যখন স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে চায়, তখন সে তার সৃষ্টিলোকের শিল্পী ভূমিকায় দেখা যায়। তখনই সে কবি হয়ে ওঠে— তার হৃদয়ে আর কণ্ঠে উঠে আসে গান। হোসেন মিয়ার সেই অপরূপ গানটি কোনো বাঙালি পাঠক ভুলতে পেরেছে?

সেই গানে সুন্দরের কী আশ্চর্য পরিপূর্ণতা! সেই সুন্দরের বিগ্রহে সম্মিলিত হয়েছে 'বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা' ফসল ফলানো সাধারণ মানুষ; এবং বর্ণময় নিসর্গ— 'মানের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার কুপি' ; এবং মানুষের কাছে বহু প্রজন্ম-বাহিত পরম-নির্ভরতার কল্পমূর্তি ঈশ্বর— চেরাগ-নাও বেয়ে আসেন সেই 'দিল জাগানি' তিনি —রবীন্দ্রনাথের 'দুখজাগানিয়া'-র মতোই। তিনি ডাক দেন— মানুষ হয় কল্পলোকের অভিযাত্রী। পার্থিব জীবনে অপার্থিবের সেই অপরূপ আহ্বানের সৌন্দর্যে মণ্ডিত সেই গানই এই নিবন্ধের শেষ কথা এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোমান্টিক সৌন্দর্য-দৃষ্টির সারাৎসার।

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু, কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা অকাল ফসল রোও
মিয়া, কত ঘুমাইবা।
মানের পাতে রাইতের পানি হইল রুপার কুপি
উঠ্যা দেখবা না
আলা করেন ঘরের চালা কেডা চুপি চুপি,
দিশা রাখবা না।
তোমার লাইগা হাওর দিয়া বাইয়া চেরাগ নাও
দিল-জাগানি আলেন যিনি, মিয়া,
চিরা-মেঘের বাদাম তুইলা বন্ধু কনে যাও?
জিগায় তারে খাঁচার চিড়িয়া।
নিদ্ ভাঙে না, দিল জাগে না বিবির বুকের শির,
পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির—
মাঝি কত ঘুমাইবা।